হতাহতের ঘটনাও ঘটতে পারে। বসনিয়া ও সোমালিয়াতে এজন্য আত্মরক্ষা করাই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল UNPKF-এর। আসলে জাতিপুঞ্জের অধীনে নিজস্ব কোনো স্থায়ী বাহিনী না থাকায় এই সমস্যাগুলি দেখা দেয়।

জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে মানবাধিকার বিষয়টি খুবই লক্ষণীয় মাত্রা পেয়েছে। সনদের প্রারম্ভেই মানবাধিকারের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা উচ্চারিত হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। একই বক্তব্য বারবার অন্যত্রও উল্লিখিত হয়েছে। সনদের প্রথম অনুচ্ছেদে মানবাধিকার সংরক্ষণ জাতিপুঞ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরই সহায়ক কর্ম হিসেবে সাধারণ সভা ও আর্থ-সামাজিক পরিষদকেও ভার দেওয়া হয়েছে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার (১৩ ও ৬২ ধারা) এই উদ্দেশ্যে একটি মানবাধিকার কমিশনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (৬৮ ধারা)। আবার ৫৫ ও ৫৬ নং ধারাতেও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়ার অন্যতম প্রকাশ্য শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদের তত্ত্বাবধানে যেসব অছি এলাকা ন্যস্ত হয়েছিল সেখানে প্রশাসনিক ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহকে মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছিল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় মানবাধিকার সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের এই গভীর দরদ জাগ্রত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কিছু বীভৎস অভিজ্ঞতা থেকে। ইয়োরোপে নাৎসী তাণ্ডব ও পূর্ব এশিয়ায় জাপানি নৃশংসতা মানবাধিকারের বিপদ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার চলাকালীন শত্রু দেশের নিরীহ নাগরিকদের ওপর জঙ্গি শক্তিগুলির অত্যাচার তীব্র ভাষায় সমালোচিত হয়। সুতরাং সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার রক্ষার আরও বেশি করে প্রয়োজন দেখা দেয়।

এছাড়া ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই ধারণা জন্মাতে থাকে যে, শুধু রাষ্ট্র নয় ব্যক্তি মানুষও আন্তর্জাতিক আইনের কাছে একটা আলোচ্য বিষয়। যুদ্ধ উত্তরকালে গৃহহীন দেশছাড়া মানুষদের দুর্দশায় বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন দেখা গেছে আপার সাইলেশিয়া অঞ্চলের পোল্ জাতীয় উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে। এরপর থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা বিশ্ব জনসমাজের কাছে একটি স্থায়ী প্রশ্ন রূপে দেখা দেয়।

শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত যখন সোচ্চার হয়ে ওঠে তখন মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন আরও শক্তিশালী রূপ ধারণ করে।

সবশেষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে যে আন্দোলন ক্রমশই স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং উৎপাদনের পরিবেশ এবং শ্রমসম্পর্ক ও কর্মীদের জীবন ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়ে যে ধরনের চিন্তাভাবনা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই পরিপ্রেক্ষিতেও মানবাধিকারের প্রসঙ্গে শ্রম-স্বার্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতে চলেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গৃহীত উদ্যোগসমূহ

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ যেসব উদ্যোগ এ পর্যন্ত নিয়েছে সেগুলি মূলত এইসব বিষয়ের সঙ্গে জড়িত—যেমন অধিকারের ধারণা স্পষ্টীকরণ, এর প্রধান উপাদানগুলি চিহ্নিতকরণ, এবং সাধারণভাবে ও আলাদা আলাদাভাবে মানবাধিকার সম্পর্কে যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে সেগুলি আইনের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখা। নীচের তালিকা থেকে অনুমান করা যাবে এক্ষেত্রে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ

মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮), গণহত্যা বিরোধী চুক্তিপত্র (১৯৪৮), শিশুদের অধিকার ঘোষণা (১৯৫৯ ও ১৯৯১), সর্বত্র জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষে ঘোষণা (১৯৬৩), উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দান বিষয়ক ঘোষণা (১৯৬০), নারীজাতির বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক ঘোষণা (১৯৬৭), ব্যক্তি মানুষকে নিগ্রহ ও নৃশংস আচরণ এবং শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য ঘোষণা (১৯৭৮), ধর্ম ও ধার্মিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সকল প্রকার অসহনীয়তা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঘোষণা (১৯৮১), নারীদের অধিকার সম্বন্ধে বেইজিং ঘোষণা (১৯৯২)।

এছাড়া UN প্রথম দিকেই মানবাধিকার বিষয়ে দুটি চুক্তিপত্র রচনা করে (Conventions on Human Rights) যা ১৯৫৬ সালে গৃহীত হয় এবং ১৯৭০ সালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে।

একইসঙ্গে UN-এর তরফে কতকগুলি চালু প্রকল্প রয়েছে ঃ যেমন মানবাধিকার সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জী, মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ, ECOSOC, UNESCO এবং ILO-তে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের প্রচার। একাজে নাটকীয় চমক কিছু না থাকলেও গুরুত্ব কিছু কম নয়।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা (General Assembly) প্যারিসে মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি সনদ প্রকাশ করে। এই *সনদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা* বা *Universal Declaration of Human Rights* নামে পরিচিত। প্রাথমিকভাবে এই সনদে ৩০টি ধারা ছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘের অনেকগুলি ধারা এই সনদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বহু সদস্য রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত এই সনদে স্বাক্ষর করে মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা সিদ্ধান্ত নেয়, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর দিনটিকে "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস" (International Human Rights Day) হিসাবে পালন করা হবে। উক্ত সনদের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল ঃ

> The People of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith on fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal right of men and women and have determind to promote social progress and better standards of life in larger freedom.

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদের বিভিন্ন ধারায় স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সহকারে বাঁচার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি অধিকারের কথা বলা হয়েছিল। তাছাড়া ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির অধিকার, কাজের অধিকার, বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অন্যদেশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার অধিকার ইত্যাদিও সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদে সোভিয়েত রাশিয়া স্বাক্ষর করেনি, কারণ সম্পূর্ণ নীতিগত কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিল না। কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে সোভিয়েত রাশিয়া মানবাধিকার সনদকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্থ-সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে বিশেষত কাজের অধিকার, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অধিকার ইত্যাদি প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদের বিরোধিতা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত পুঁজিবাদী দেশ, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত রাজনৈতিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে চেয়েছিল।

পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল। প্রথমটি ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্র (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) এবং দ্বিতীয়টি ছিল নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্র (International Covenant on Civil and Political Rights)। প্রথম চুক্তিপত্রটি কার্যকর হয় ১৯৭৬ সালের ৩ জানুয়ারি, এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭৬ সালের ২৩ মার্চ। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চুক্তিপত্র দুটিতে স্বাক্ষর করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপরোক্ত চুক্তিপত্র দুটিতে স্বাক্ষর করেনি।

উপরোক্ত চুক্তিপত্র দুটি ছাড়াও রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে মানবাধিকার সংক্রান্ত বেশ কিছু কনভেনশন সম্পাদিত হয়। এই কনভেনশনগুলি সংগঠিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন (United Nations Human Rights Commission) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই কনভেনশনগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গণহত্যার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৫১), গণিকাবৃত্তি অবসান সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৫১), বাধ্যতামূলক শ্রমের অবসান সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৫৯), বর্ণবৈষম্য বা Apartheid-এর বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৭৬), নারীদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৮১), দৈহিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুর শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৮৪) ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৮৬)।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের যে মানবাধিকার সনদ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সনদে উনিশ শতকীয় উদারপন্থী ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। আবার একইসঙ্গে এই সনদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে উনিশ শতকীয় উদারপন্থার সীমা অতিক্রম করেছিল। সেই অর্থে মানবাধিকার সনদে একই সঙ্গে উদারপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার এক অস্বস্তিকর সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সনদের গুরুত্ব এতটুকু কমেনি। এই সনদের মাধ্যমে মানবাধিকার সর্বপ্রথম একটি আন্তর্জাতিক ভিত্তি পেয়েছিল। বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইনের পরিধি অতিক্রম করে মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা একটি বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ঘোষিত হওয়ার পরই মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার আন্দোলন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৫০ ও

১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ম্যাক্‌কার্থি যুগীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্টদের এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষদের দমন করার জন্য একাধিক জনবিরোধী আইন প্রণীত হয়েছিল। তাছাড়া মার্কিন সামরিক বাহিনী ভিয়েতনামে এবং লাতিন আমেরিকার কিছু দেশে অন্যায় আগ্রাসন চালিয়েছিল।

উপরোক্ত ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জোরদার মানবাধিকার আন্দোলন সংগঠিত হয়। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা, এমনকি উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসেন। এই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন তৈরি হয়। এই সংগঠনগুলির মধ্যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International) একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। বিশ্ব জুড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অবিরত জেহাদ ঘোষণা করে চলেছে এই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত ঃ

> Amnesty International has acquired an immense reputation as a crusader for human rights all over the world. It is considered to be one of the most effective international pressure groups championing the cause of human rights.[১]

১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ভিয়েতনামে গণহত্যা চালিয়েছিল তখন তদন্তের জন্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ভিয়েতনামে অনুসন্ধানী দল পাঠায়। এই অনুসন্ধানী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল। ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর বর্বর হত্যালীলাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছিল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এই সংগঠন ছাড়াও এশিয়া ওয়াচ (Asia Watch), হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচ (Human Rights Watch) প্রমুখ মানবাধিকার সংগঠনও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। বিশ্বের বহুস্থানে সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট অত্যাচারী শাসকের পীড়নে মানুষ তাদের আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষেরাও তাঁদের সংগ্রাম চালানোর তাগিদে নিজস্ব মানবাধিকার সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র

১. A. R. Desai (ed.), *Violation of Democratic Rights in India*, p. 187.